ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ

বিজয় দত্ত

ঘরটির চেহারা সম্ভ্রম উদ্রেককারী। অত্যাধুনিক বাতানুকুল ব্যবস্থাতো বটেই কিন্তু ঘরে ঢুকেই তাপমাত্রার পরিবর্তনে যে শিহরণ জাগে তার চেয়েও নাড়া খেয়ে যায় চোখ, ঘরের সচেষ্ট বৈভব-বিজ্ঞাপনহীন আসবাবে, মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে দেওয়ালের রঙে (দেওয়ালের রঙ বোধহয় বলে না, কী জানি বলে?), বাহুল্য বর্জিত অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায়।

আমি তখনও ঘরে ঢুকিনি। শুধু বাঁশি শুনেছি মানে কিঞ্চিৎ আঁচ পাচ্ছি। বেশ কয়েকজন লাইন দিয়ে বসে, সবারই পোশাক-আশাক পরিপাটি। বাইরে খান কয়েক টয়টো ডাটসন অপেক্ষমান। ওদের দেওয়া সুদৃশ্য কার্ডগুলি নিয়ে যে সুদর্শন যুবক ওই ঠান্ডা ঘরে অর্ধেক ঢুকেছেন এবং বেরিয়ে আসছেন তাঁর মুখ চোখের তটস্থ ভাব ভেতরের ওজন জানিয়ে দিচ্ছে।

আমার তো, কী বলে গিয়ে, কার্ড নেই, ঝোলা ব্যাগ থেকে ডায়রির পাতা ছিড়ে লিখে দিলাম, পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমের সাথে জড়িত, কথা বলতে চাই।

আসলে, এবারের বাংলাদেশ ভ্রমণে দ্বিতীয় দিনেই এমন এক ব্যাক্তির মুখোমুখি হব, ঠিক ভাবিনি। বনগাঁ হয়ে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রথম দিনটি কাটালাম যশোরে। আজ সকালে এসেছি কুষ্টিয়া। আর বাঙালির কাছে কুষ্টিয়া মানেই তো শিলাইদহ আর লালন মাজার। তা, সে সব ছুঁয়ে সন্ধেতে এসেছি বাসের অগ্রিম টিকিট কাটতে। রাতটা কাটিয়ে কাল সকালের বাসেই ঢাকা। ওই টিকিট কাটতে গিয়েই জানতে পারলাম বাস কোম্পানির মালিক একটা দৈনিক সংবাদপত্রেরও মালিক-সম্পাদক। উপরন্তু তিনি বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের বেশ ওজনদার সদস্য। ও বাবা, এ যে একের ভিতর তিন। কৌতুহল হল। ভাবলাম, কথা বলতে পারলে মন্দ হয় না। অতএব ঠান্ডা ঘরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায়।

যে ভাবে লাইন পড়েছে, বুঝলাম বেশ কিছুক্ষুণ অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক আছে, আমার সময়ের অভাব নেই, একটি চেয়ারেরও যখন জুটেছে, সামনের টেবিলের ওপর রাখা সেদিনের কাগজটা টেনে নিলাম। ইতিমধ্যে সেই সুদর্শন যুবকটি জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার কতক্ষণ লাগবে? বললাম, তা তো বলতে পারছি না, দু-চার মিনিটেও হয়ে যেতে পারে আবার — মানে ইট অল ডিপেন্ডস — দু-তিন মিনিট পরেই ডাক পড়ল। ঢুকলাম সেই তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে। বাস কোম্পানির মালিক রাজনীতিবিদ সম্পাদক মশাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন, আসেন আসেন, বসেন। হাত মিলিয়ে বসতেই বললেন কী খাইবেন কন, ঠান্ডা? চা? কফি? সঙ্গেই বাড়িয়ে ধরলেন বিদেশি ব্র্যাণ্ড বেনসন অ্যান্ড হেজেস-এর খোলা প্যাকেট আর দামি লাইটার।

এই সুযোগে ওজন বুঝে নিতে চাইলাম। কোটিপতি কিনা জানি না তবে লক্ষ লক্ষ পতিতো বটেই। হু, এঁরাই তো রাজনীতি করবেন। বয়স, যোগ-বিয়োগ চল্লিশ। এককালের লড়াকু চেহারা। বর্তমানে একটু আয়েশ, একটু মেদ, অকটু অ্যালকোহল ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওর ঘরে ছিলাম প্রায় দেড় ঘন্টা। কথাবার্তা হল অনেক এবং যথেষ্ট খোলামেলা। বাংলাদেশে গত নির্বাচনে পূর্বতন শাসক দলের প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, নির্বাচন পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক পরিকল্পিত অত্যাচার নির্বাচনের ছয়মাস পরে একেবারে বর্তমান অবস্থা এমনকী কুষ্টিয়ায় সরস্বতী। কথাবার্তাই ছিল রাজনৈতিক, চালু রাজনৈতিক কথা, পার্টিবাজির কথা, বিরোধী দলের ওপর সব দায় চাপানোর কথা, নিজের এবং নিজের দলের প্রচারধর্মী কথা। কিছু নতুন এবং হতে পারে একতরফা তথ্য জানা গেলেও মূলত সবটাই ছিল গতানুগতিক রাজনৈতিক কচকচি। এর অনেকটাই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা ছিল বা আন্দাজ ছিল।

আমার বিস্ময় ও বিপন্নতা অন্য জায়গায়। ভদ্রলোক একেবারে আজকের রাজনীতিবিদ, ভোটের রাজনীতিবিদ, ক্ষমতাসন্ধানী রাজনীতিবিদ, ন্যায়-নীতি বিবেক বর্জিত কট্টর রাজনীতিবিদ। আমাদের এই দেশে, আমাদের চারপাশে যে সব রাজনীতিবিদ দেখি, যাদের দুবেলা গালাগাল দিই আবার যাদের অনুগ্রহেই প্রায় আমাদের জীবনযাপন, এদেরই যেন কাউন্টার পার্ট বা মাসতুতো ভাই, একটা তফাৎ সহ।

কী সেই তফাৎ? ভদ্রলোক ঘন্টা দেড়েক কথা বললেন। প্রতি পাঁচটা বাক্যে একবার অন্তত আল্লার নাম নেওয়া, আল্লার দোহাই দেওয়া, আল্লাকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা। আমাদের এদিককার ধর্মব্যবসায়ীদের মতো, গুঠাকুরদের মতো, অমুক বাবা, তমুক বাবাদের মতো। কথায় কথায় আল্লা, কথায় কথায় আল্লা মেহেরবান, আল্লার দোয়া, কথায় কথায় কোরানের কোটেশন। যেন ইনি যা কিছু করেন, তা সরস্বতী পুজোয় যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের তুলে আনাই হোক, ওর ভাষায় দুষ্কৃতিদের, অবশ্যই বিরোধী দলের, এলিমিনেট করাই হোক, সবই করছেন আল্লার নির্দেশে, আল্লার ইমানের খাতিরে। ঠিক যেন 'সবই তাঁর ইচ্ছা'। আম

ার কাছে অবাক করা পরিস্থিতি।

আমাদের এ দেশে কোন রাজনীতিবিদের মুখে, অন্তত অমুসলিম রাজনীতিবিদের মুখে, ডান-বাম যে পন্থীই হোন না কেন, এমনকি ইদানিংকালের হনুমান বাহিনীর মুখেও এত বেশি ধর্মের ধুয়া, ধর্মের অজুহাত পাওয়া যায় না। প্রতিমুহূর্তের জীবনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে ধর্মের এই অনুপ্রবেশ কেন? প্রতিটি অসৎ কর্মে ধর্ম কখনও তরবারি রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন? কী ভাবে? এর প্রয়োজনীয়তা কতটা? এর ফল কী? এর ফলে কোথায় পৌঁছচ্ছে মানব সমাজ।

গুণীজনেরা বলেন ধর্ম হল একটা দর্শন, একটা আধার যা সমাজকে ধারণ করে, ধরে রাখে। বিজ্ঞানের ভাষায় ধর্ম হল পদার্থের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। নিজস্ব গুণ। পদার্থের এই ধর্ম আবার পরিবেশের সঙ্গে, আরোপিত পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্টায়। ভারত মহাসাগর থেকে এক আজলা জল হিমালয়ের বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গেলে বরফে পরিণত হবে। বিজ্ঞান এও দেখিয়েছে, আরোপিত পরিবেশ বা প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যদি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটান যায় তবে পদার্থের পূর্বতন ধর্মের মৌলিক বা চিরস্থায়ী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে।

মানব সমাজে ধর্মের এই ভূমিকাটি অনেক জটিল, অনেক ভঙ্গুর, অনেক স্পর্শকাতর। তবু মনে হয়, বিজ্ঞানের মূল সূত্রটি চেতন সমৃদ্ধ সমাজের ধর্মেও প্রযোজ্য।

মানুষের ধর্ম কী? এ নিয়ে লক্ষ বছর ধরে লক্ষ কোটি কথা বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে, বলা হবেও। এই সমস্ত কথা যোগ করে এককথায়, একেবারে এককথায় বলা যায় কি — মানুষের ধর্ম বেঁচে থাকা? এবং মানুষ যেহেতু চেতন প্রাণী, চিন্তা শক্তি সম্পন্ন প্রাণী, তাই তাঁর বেঁচে থাকা হওয়া চাই আনন্দের। আর মানুষের চেতনাই তাকে শিখিয়েছে আনন্দ কখনও একা হয় না। আনন্দ যত ভাগ করা যায়, যত বন্টন করা যায়, ছড়িয়ে দেওয়া যায়, জড়িয়ে নেওয়া যায় ততই বাড়ে, পরিপূর্ণ হয়। মানুষ এও জেনেছে আপন দুঃখের ভার ভাগ করে নিতে পারলে কমে, সহনশীল হয়। আর তাই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সুখে দুঃখে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষ।

এটাই মানুষের ধর্ম, মানবিক ধর্ম, মৌলিক ধর্ম যা সমাজকে ধরে রাখে, মঙ্গলময় বাঁধনে বাঁধে। ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু, অর্থানৈতিক বিকাশের অসমান স্তরের কারণে সভ্যতার ক্রমবিকাশ সব জায়গায় সমান গতির হয়নি কিন্তু মানুষের এই মূল ধর্ম, মানবিক ধর্ম — এ কিন্তু চেতনার মৌল গুণ, বিকাশের মৌলিক আধার।

মানব সভ্যতার এই ক্রমবিকাশ অবশ্যই সোজাপথে এগোয়নি। সমস্যা এসেছে। আদিম সাম্যবাদের কাল পেরিয়ে যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মানুষ শিখল এবং উদ্বৃত্ত মজুত করতে জানল। একই সঙ্গে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সাথে সাথেই সমস্যার বিস্তার। পরিবার ভিত্তিক গণ্ডীবদ্ধতা সামাজিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিল, নজরের চৌহদ্দি গেল ছোট হয়ে, আনন্দ বেদনার উৎস আর তত সামাজিক রইল না। মনুষ্য ধর্ম অবহেলিত হতে থাকল, মানুষ অ-সামাজিক হতে শুরু করল, অর্থনীতির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত হয়ে গেল।

এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে শ্রেণি ইতিমধ্যে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, ক্ষমতায় আছে, উৎপাদনের মূল উৎসগুলি কুক্ষিগত করতে পেরেছে তাঁরা তাঁদের অবস্থানকে দৃঢ় করতে, মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় — মানুষের ধর্মকে চাপা দিতে, বিদ্রোহ ঠেকাতে কিছু আপাত সুদর্শন, নির্মল ব্যক্তি চরিত্রের মানুষের মাধ্যমে আরোপিত ধর্মের প্রচার শু করে। এইসব ধর্ম মানবিক ধর্মের জাগরণ ঘটাল না, যে যে কারণে মানুষ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে গেল সেই সব অসাম্য দূর করার কার্যকরী উপায় দেখাল না। এই সব ধর্ম মানুষকে ফলের আশা ছাড়াই কর্ম করতে বলল, আজকের জীবনের সব কষ্টকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে অলীক এক বেহেস্তের স্বপ্ন দেখাল, সামাজিক অন্যায়ের প্রতিরোধে না গিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করে এড়িয়ে যেতে শেখাল। মূল কথা এটাই, বর্তমান অবস্থাটা, এই শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাটা বজায় থাকুক, তুমি অসাম্যের বলি হও কিন্তু বিদ্রোহ করো না, ত্যাগ ও তিতিক্ষার তত্ত্বে নিজেকে ধোঁকা দিয়ে স্থিতাবস্থা, যে অবস্থায় সামান্য কিছু মানুষের প্রচুর লাভ তাকে বজায় রাখ। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই সব আরোপিত ধর্ম বৃহৎ মনুষ্য সমাজের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারেনি বরং ক্ষতিসাধন করেছে অনেক অনেক।

এইসব ধর্মগুলি মানুষের আঞ্চলিক চরিত্র অনুধাবন করে, ভৌগোলিক বিশেষত্বকে নজরে এনে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির, যে সংস্কৃতি প্রতিদিনকার জীবনযাপনে হাসি-কান্না আনন্দবেদনার অনুভূতি থেকে গড়ে উঠেছে, সেই সংস্কৃতির মিশেল দিয়ে, স্থানীয় অনুষঙ্গ সাথে নিয়ে মানুষকে এক স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা হওয়ার লোভ দেখাল। কিছু বিশেষ আচরণ, পোশাক আশাকের নির্দিষ্ট ঢং, পূজা-অর্চনা-উপাসনার বিশেষ কতগুলি ভঙ্গি এমনকি অনেক সময় মনুষ্য চেহারায় চিহ্নের মাধ্যমে তাদের এক একটি গোষ্ঠীকে আবদ্ধ করল। কিছু মানুষের সুচিন্তিত বিভাজনের কায়দায় পৃথিবীর অন্যতর মানুষ থেকে তারা হয়ে গেল আলাদা। শিখ-পাঞ্জাবিদের এমনই চুল দাড়ি পাগড়ির স্টাইল, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তাকে দেখেই বোঝা যাবে যে সে শিখ ধর্মাবলম্বী। এতে দুই অপরিচিত শিখ হয়তো-বা প্রথম দর্শনেই কিছুটা আত্মীয়তাবোধ করতে পারেন, গোষ্ঠীর নিরাপত্তাবোধ করতে পারেন, কিন্তু ওরা দুজন যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে একটু আলাদা হয়ে গেলেন সেটা ভেবে দেখলেন কি?

এভাবেই, যারা ঠিক আমার ধর্মের লোক নয়, তাদের সঙ্গে দুরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকল। আমার গোষ্ঠীতে আরও বেশি মানুষ আসুক, এই স্বাভাবিক আকাঙ্খা থেকে ধর্মপ্রচারের যে সমস্ত পদ্ধতি পাওয়া গেল তার সবগুলিতেই মনুষ্যধর্ম অস্বীকৃত হল। কেন না আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠএই ঘোষণার মধ্যেই, বলা হোক বা না হোক, অন্য ধর্মগুলি শ্রেষ্ঠ নয় — এই বয়ান থাকছেই। কার বেহেস্ত কত হুরি পরি দ্বারা বেষ্টিত এসব লোভ দেখানতো থাকলই, জাগতিক সুখভোগ বা অস্ত্রের ঝনঝনানিও প্রয়োজনে কাজে লাগান হল।

এইসব ধর্মাচরণ যতক্ষণ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে, যদি তার কোন বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ না ঘটে অন্তত ততক্ষণ সমস্যাটাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ সমষ্টির ওপর প্রভাব ফেলবেই — অচেতনভাবে বা সচেতনভাবে। আর আছেন আমাদের সমাজপতিরা, অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষেরা, রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিরা। তাঁরা চাইবেন, অত্যন্ত সচেতনভাবেই চাইবেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই চাইবেন ধর্মের সামাজিকীকরণ, উৎপাদন সম্পর্কের শ্রেণিবিভাগকে গুলিয়ে দিতে উৎপাদক সম্পর্করহিত কতগুলি

অলীক ধর্মভিত্তিক শ্রেণি বা গোষ্ঠীতে সমাজকে বিভক্ত করতে, আসল সমস্যা থেকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে, অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে।

ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে সমস্যা যেমন একটাই। একশ কোটি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের কোন সমস্যা নেই। বুদ্ধির বিকাশ, চেতনার বিকাশ, সৌন্দর্যবোধের বিকাশের কোন সমস্যা নেই। মানবিক ধর্মেরও কোন সমস্যা নেই। অহো! কী সুখের কাল কাটাইতেছি আমরা। সমস্যা শুধু একটাই। এই বিশাল ভারতবর্ষের এক বিশেষ ভূমিখণ্ডে একটি মসজিদ হইবে না একটি মন্দির হইবে? যে মসজিদটি ছিল সেটিইতো বানর সেনার দাপটে গিয়াছে। কী আর করা যাইবে, দেশে নব অপেক্ষা বানর-এর সংখ্যাই যখন বর্ধমান। অবশ্য মসজিদ বলে আমার মনে বিশেষ কোন দুর্বলতা বা অনুরাগের সৃষ্টি হয় না তবে একটি ঐতিহাসিক ভবন এভাবে নষ্ট করা হল — এ আমার সারা জীবনের লজ্জা। আচ্ছা, ওখানে বুলডোজার চালিয়ে একটা খেলার মাঠ বা স্টেডিয়াম করে দিলে হয় না?

বাংলাদেশে দেখলাম ধর্মের সমস্যা দ্বিমুখী।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের যে ধর্ম, তার উৎসভূমি পশ্চিম এশিয়া। সেখানকার চরম জল-বায়ু, মভূমি প্রায় ভূ-প্রান্তর, সেখানকার ক্ষ কঠোর জীবনশৈলীকে আধার করে যে ধর্মের বিকাশ তার পরতে পরতে রয়েছে সেই সংস্কৃতির ছোঁয়া। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তার প্রসার। কারবালার প্রান্তরে যে বিষাদ সিন্ধু রচিত হল সেখানেও কিন্তু হত্যা আর প্রতিশোধের লড়াই, ক্ষমতা-অধিকারের লড়াই, আধিপত্যের লড়াই। খু-শুখু প্রকৃতির বুক থেকে জীবনরস ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই থেকে যে সংস্কৃতির বেড়ে ওঠা — তার প্রতিফলন তো সেখানকার আরোপিত ধর্মে থাকবেই। তারপর একদিন দ্রুতগামী অশ্বের খুরধ্বনির তাল মিলিয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানির সাথে সেই ধর্ম আছড়ে পড়ল ভারতবর্ষে। জলজঙ্গল আর নদী নালা খাল বিলে ভরা পূর্বভারতের এই বাংলা অঞ্চলকে একসূত্রে বাঁধল সুলতানি রাজশক্তি। সুবে বাংলা শব্দটির প্রচলনও বোধ করি তখন থেকেই।

বাংলার লক্ষ মানুষ এই নতুন ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হল প্রধানত দুটি কারণে। তৎকালীন হিন্দু সমাজ ধর্মের দোহাই দিয়ে অজস্র জাতপাতে বিভক্ত করে রেখেছিল সমাজকে। বহু মানুষকে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষকে অন্ত্যজ শ্রেণী করে রাখা হয়েছিল যুগ-যুগ ধরে। বর্ণহিন্দুদের গোষ্ঠী সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই তাদের মনুষ্যেতর জীবন যাপনে বাধ্য রেখেছিল। শ্রমের মূল্যটুকু দেওয়া হয়নি তাদের এমনকি মনুষ্যত্বের সাধারণ সম্মানটুকু দেওয়া হয়নি তাদের। মাথা উঁচু করে বাঁচার তাগিদে এইসব মানুষেরাই আশ্রয় নিল ইসলাম ধর্মের। প্রলোভন ছিল আরও একটা। রাজার ধর্ম গ্রহণ করলে হয়তো-বা রাজ অনুগ্রহ জুটতে পারে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে মানবিক ধর্ম ছাড়া কোন আরোপিত ধর্মই মানব সমাজের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটাতে সাহায্য করে না, উন্নতি সাধন করে না। সামাজিক পরিকাঠামো বদল করে, অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের কোন কাঙ্খিত পরিবর্তন এই সব ধর্ম সমর্থন করে না বরং, শাসন শোষণের বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই ধর্মের পরিকল্পিত সৃষ্টি। বাংলার মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। বরং বলা যায় জীবন যন্ত্রণা একটু বাড়ল, এল সাংস্কৃতিক সংকট।

নদীমাতৃক বাংলার ভূ-প্রকৃতির বিশিষ্টতা, এই নরম মাটিতে উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গড়ে ওঠা খাদ্যভ্যাস, সবুজ শ্যামল প্রকৃতির নয়নশোভন বাতাবরণ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা বাংলার মানুষের প্রকৃতি স্বাভাবিকভবেই পেলব ও নমনীয়। এই মাটি ছুঁয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর চেহারা, খাদ্যভ্যাস, পোশাক আশাক, মুখের বুলি, আচার ব্যবহার, আনন্দ বেদনার প্রকাশভঙ্গি, জীবনচর্চা প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে তাই হল বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি তার মাছে ভাতে, তার রসগোল্লা সন্দেশে, তার পাট পাতার বড়া আর মোচার ঘন্টে, তার দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুটে, তার বাউলের দেহতত্ত্বে, আববাসউদ্দিনের পল্লীগানে, তার লালন-চর্চায়, পীর ফকির সুফি সন্তদের জীবনমুখী গানে। এ সংস্কৃতি তার রবীন্দ্রনাথের জীবন সন্ধানে, হিজল শাপলার ভিজে গন্ধে, তার সন্ধ্যা প্রদীপের নরম আলোয়, তার প্রাণ ভরা মা ডাকে, তার বাংলা ভাষায়। হাজার বছরের জীবনচর্চার মঙ্গলময় দিকগুলিকে নিয়ে, ক্ষণগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বাঙালি জীয়নরস। এ সংস্কৃতির বিহনে বাঙালির উৎসটি যাবে শুকিয়ে। বাঙালি আর বাঙালি থাকবে না।

ধর্ম যদি মানব চেতনার কোন স্খলন পরিমার্জনে উদ্বুদ্ধ করে, যদি জীবনদর্শনে চিরায়ত মানবিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে, নানাবিধ লোভ আর ক্ষুদ্রচিন্তার আক্রমণ থেকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে তবে ধর্মের সেই সার অংশের অনুধাবন করা যেতে পারে একান্তই ব্যক্তিগত স্তরে। কিন্তু যখনই ধর্মকে সামাজিক ক্রিয়া কলাপের হাতিয়ার করে তোলা হয় তখনই আসে গণ্ডীবদ্ধতা আর সংকীর্ণতা।

স্বাভাবিক মানবিক ধর্মের অধিকারি মানুষ কোনও রকম আরোপিত ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই চলতে পারে। ধর্মবিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত স্তরে রেখে প্রকাশ্যে তার বিজ্ঞাপন না করেও মানুষের দিন চলে। কিন্তু যে মাটিতে আমার জীবনধারণ সেই মাটি থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি বাদ দিয়ে আমি যে এক পা চলতে পারি না, সামাজিক থাকতে পারি না। আমার ধর্মবিশ্বাস যদি থাকতেই হয়, যেন আমার সংস্কৃতির পরিপন্থী না হয়, যেন আমার প্রতিমুহূর্তের জীবনযাপনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে এই বৈপরীত্য, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় বেশি চোখে পড়েছে, প্রাণে বড় বেজেছে। এক আরোপিত ধর্মকে বজায় রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই সংস্কৃতির দোটানায় মনে হয়েছেবাংলাদেশকে, বাঙালিকে। নামাজ পড়তে হবে পশ্চিমমুখো হয়ে। কেন? আল্লা কি শুধু ওইদিকেই আছেন? অন্যদিকে ফিরে নামাজ পড়লে আল্লা কি অসন্তুষ্ট হবেন? আল্লা কি এতই সংকীর্ণমনা? নাকি ওই ধর্ম পালন করতে হলে পশ্চিমদিকের বিশেষ স্থানটিকে, বিশেষ সংস্কৃতিটিকে প্রাধান্য দিতেই এই নিদান?

দুর্বোধ্যতার আড়ালে এক ধরনের সম্ভ্রম সৃষ্টি করার প্রয়াস চলে। এদিকে দেখি ঈশ্বর আরাধানার সব শব্দই সংস্কৃততে। সংস্কৃত নাকি দেবভাষা, বিশেষ কজন লোকই ওই দেবভাষায় পারঙ্গম। আমরা আমজনতার শুধু ওই ভুল হোক শুদ্ধ হোক, উচ্চারণ শুনে, অর্থ না বুঝেই পুনরাবৃত্তি করেই সন্তুষ্ট থাকব এই ভেবে যে আমার কথা আমার প্রার্থনা আমার স্তব ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। কেন? ঈশ্বর কি এতই স্বল্পজ্ঞানী যে ঠিক ওইভাবে ওই শব্দে না বললে শুনবেন না, বুঝবেন না? গোটা প্রক্রিয়াটি পরিকল্পিতভাবে সাধারণের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে একটি বিশেষ সংস্কৃতির প্রভাব বজায় রাখার জন্য এবং এতদ্বারা বিশেষ কিছু মানুষের, বিশেষ এক শ্রেণীর সুবিধার জন্য। এবং সে সুবিধা একান্তই ইহলৌকিক, বস্তুগত এবং বলাই বাহুল্য, অর্থনৈতিক। বাংলাদেশে এই সমস্যার চক্রব্যূহ যেন আরও জটিল।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হল ইসলাম। কথায় কথায় বলা ইসলামিক স্টেট। সেটা কী বস্তু? খায় না মাথায় দেয়? রাষ্ট্র তো একটা যন্ত্র, শাসনযন্ত্র। মার্কসবাদী শ্রে

ণিচেতনা নিয়ে বলা যায় শোষণযন্ত্র। ক্ষমতাসীন শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণির ওপর শোষণ বলবৎ রাখার যন্ত্র হল রাষ্ট্র। এইটাই রাষ্ট্রের সৃষ্টির ইতিহাস, এইটাই তার সংজ্ঞা। মার্কসবাদ তাই বলে, এই রাষ্ট্রযন্ত্র কোন শ্রেণির অধীনে থাকবে সেটাই বিবেচ্য। মুষ্টিমেয় পরান্নভোজী ব্যাক্তির, না যারা শ্রমে-স্বেদে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই শ্রমিক-কৃষকের হাতে?

এ কথা কিন্তু সাধারণ বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বোঝেন যে চরিত্র যাই হোক রাষ্ট্র একটি যন্ত্র। একটি ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রত্যেকটি যন্ত্রের একটি স্বাভাবিক ধর্ম থাকে। যে কাজের জন্য যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে সেই কাজটি করা সেই যন্ত্রের ধর্ম। যন্ত্রের আর কোন ধর্ম থাকে না। আর কোন ধর্ম হয় না। ড্রিলিং মেসিনে নাম বা বাহ্যিক রঙচঙ যাই হোক না কেন। এমনকি সেই মেসিনের অপারেটর বা চালক লুঙ্গিই পন বা উপবীত ধারণ করে গ ায়ত্রী জপেই আসুন; আল্লা-আল্লাই কন বা রাম-রামই বলুন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামো ধনিকশ্রেণির স্বার্থে গঠিত। নাম তার গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা সম াজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, সোনার পাথরবাটি বা কাঁঠালের আমসত্ব ইত্যাদি যাই হোক না কেন। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ধনিক শ্রেণির স্বার্থ দেখার জন্য তৈরি। সংবিধানের প্রথম পাতায় যতই জনগণের দ্বারা দিয়া কর্তৃক লেখা থাকুক না কেন এ রাষ্ট্রযন্ত্র, এমনকী — চালক পালটালেও, কতবারইতো কতরঙের জামাকাপড় পরে চালক এলেন, যন্ত্র তার নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ীই কাজ করবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গেই দেখছি, একেবারে ছাপমারা আমাদের চালক দিয়ে দেখছি — যন্ত্র তার কাজ করেই য াচ্ছে। তফাৎ কি হয়নি কিছুই? হ্যাঁ, হয়েছে। বহুদিন ধরে চালাতে চালাতে চালক বুঝছেন না যে তিনি আর চালাচ্ছেন না, যান্ত্রই তাকে চালাচ্ছে। আর এত পতাকা, মুষ্টিবদ্ধ হাত আর শব্দ দিয়ে যন্ত্র সাজানো হয়েছে যে বোধহয় ন্যাবা ধরে গেল, চোখেও, বোধেও। ভাবছি, কে জানে কোন দাড়িওয়ালা খটোমটো জার্মান ভাষায় কবে কী লিখেছিলেন — যন্ত্র ভেঙে টেঙে আমাদের প্রয়োজন অনুসারী মৌলিক যন্ত্র গড়তে হবে — আর ওসবের দরকার নেই, বেশ তো আছি, এই ড্রিলিং মেসিন দিয়েই সেপিং করা যাবে, দেশের দশের সেপটা পালটে দেওয়া যাবে।

বাংলাদেশে তো গোদের ওপর বিষফোড়া। পাকিস্তানি শোষণের জোয়াল ঠেলে ফেলে যদি-বা মাথা তুলে দাঁড়াল বাংলাদেশ, সাংবিধানিক মূল কাঠামোটি রইল একই, কিছু উর্দু বলা মানুষের বদলে বাংলা বলা মানুষের দাপট শু হস। এদেশে '৪৭-এর পর আমরা যেমন সাদা চামড়ার বদলে বাদামি চামড়া পেয়েছি। ব্রাউন-মিলার-হেনরীদের বদলে পেলাম বিড়লা-টাটা-আম্বানিদের। মেসিনটা কিন্তু ড্রিলিং রইল। বাংলায় ড্রিল করলে বাঙালির রক্তক্ষরণ কি কম হয়? বিষফোড়াটি তো আরও মারাত্মক। এ তো সংস্কৃতির সমস্যা, আইডেনটিটির সমস্যা।

ইসলাম ধর্মের সৃষ্টির ইতিহাস, পরিস্থিতি, পরিবেশ পর্যালোচনা করে একথা অবশ্যই বলতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি বদলের সাথে, সময়ের এই ধর্মের ব্যবহারিক আচরণবিধি আধুনিক হয়নি। এই একুশ শতকে, হাতের মুঠোয় অনুভব করা যায় যে পৃথিবীর নাগরিক হয়ে এইসব অনুশাসন ক্রমশই কি বিভেদ তুলছে না? দিনে পাঁচবার নমাজ, বছরের একমাস রোজা, বিশেষ দিনে পশুহত্যার মহোৎসব — এমনই আরও কত বিধিনিষেধ। এবং, এর সবটাই সোচ্চারে, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে, সামা জিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত করে। বলা যেতেই পারে, এসব অনুশাসন মানলেই বা কী ক্ষতি? হ্যাঁ, ক্ষতি আছে।

ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে, অতিরিক্ত অনুশাসন, বাহ্যিক বিশেষ আচরণবিধি মানুষকে মহীয়ান করে না, দৃষ্টির প্রসারতা বাড়ায় না বরং তাকে কূপমণ্ডুক করে তোলে। কূপমণ্ডুক মানুষের অজ্ঞতা আর গোঁড়ামি জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতার। বিচ্ছিন্নতা থেকে আসে নৈরাজ্য, নৈরাজ্য জন্ম দেয় উগ্রতার, সন্ত্রাসের, মানুষ তার হুঁস হারিয়ে ফেলে।

মানুষ তার বাঁচার প্রয়োজনে লতাপাতা খায়, ফলমূল খায়, মাছ মাংস ডিম খায়। এককথায় বলা যায় মানুষ কী খায়। এর পিছনে তার স্বাদ, উপকারিতা, পাওয়া না পাওয়া, অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলি কাজ করে। তা, আমি আমরা চি অনুযায়ী কোন খাদ্য গ্রহণ করলে অন্যের চোখে হেয় বা ঘৃণ্য হব কেন? আমার উপাসনা গৃহের সামনে যদি কেউ আমার অপছন্দের মাংস, অবশ্য কেন অপছন্দ সেটাই পরিষ্কার নয়, ফেলে যায় তাহলে সেই সামান্য ঘটনাকে ঔদার্যের সাথে গ্রহণ না করে দাঙ্গায় মেতে উঠি কেন? যে ধর্মীয় অনুশাসন আমাকে সহনশীলতা না শিখিয়ে ডমিনেট করতে, দাঙ্গা করতে প্ররোচিত করে সেই ধর্ম না থাকলে কী হয়?

বাংলাদেশে দেখলাম কথায় কথায় কোরাণের উদ্ধৃতি, হাদিসের কোটেশন। দিচ্ছে কারা? যারা প্রতিমুহূর্তে অন্যায় করছেন, অত্যাচার করছেন, সমস্ত রকম দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত এবং এরা এ সমস্ত কিছুই করছেন ইসলামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, বোরখায় রূপান্তরিত করে।

জিরায়ত, এহরাম, জোহরা, লাববায়েক, ইবাদত, আছর, তাওয়াফ, মাগরিফ, খুৎবা, তাকওয়া, মাকবুল, মাসনুন, শিরকে খফী, এশা, নাসিল, আরাফার, কুফরী ইহরাম, তালবিয়াহ ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শব্দগুলো এবং এরকম আরও অনেক শব্দ আজ বাংলাদেশের হাওয়াতে পাওয়া যাবে। কুষ্টিয়ার একের ভিতর তিন ভদ্রলোকের মতো বিশেষ কিছু মানুষের মুখে খই ফোটার মতো এই ধরনের শব্দ ফুটতে শুনেছি। শব্দগুলি আরবি শব্দ।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, সাগরদাড়ির পথে, নড়াইলে মধুমতি পাড়ের গ্রামে, পটুয়াখালি পেরিয়ে কুয়াকাটার পথে, বিক্রমপুরের একাধিক গ্রামে, চট্টগ্রামের রাঙামা টির অঞ্চলে, টেকনাফের গভীরে বা কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহের পথে বহু গ্রামীণ মুসলমানের সঙ্গে কথা বলেছি। এইসব শব্দের অর্থই তাঁরা জানেন না। কয়েকজন সসংকোচে এও জানিয়েছেন, ওই যে দিনে পাঁচবার মসজিদ থেকে মাইক সহযোগে কিংবা মাইক ছাড়াই বিশেষ সুরে ছন্দে নমাজ পড়া হয় তার অর্থ তাঁরা বোঝেন না। লজ্জা মিশ্রিত গর্বের সঙ্গে এও বলেছেন —নমাজ, সে তো পড়তেই হবে, আল্লার কাছে দোয়া মাঙা, খেয়াল করতে হবে শব্দটি প্রার্থনা নয় দোয়া, আমি বুঝি ন া বুঝি আল্লাতালা তো বুঝবেন।

এইখানে সমস্যা। জীবন চলছে বাংলায়, সবকিছুই হচ্ছে বাংলায় কিন্তু ধর্ম বিষয়ক, ইসলাম সম্পর্কিত কথাবার্তা বলতে হবে অধিকাংশের দুর্বোধ্য আরবিতে। ত াহলেই বোধকরি আল্লাতালার আরও কাছের লোক, নিজের লোক হওয়া গেল, আরও একটু মুসলমান হওয়া গেল। এবং এভাবেই ধাপে ধাপে পশ্চিম এশিয়দের মতো দাড়ি, লম্বা লম্বা পোশাক, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মাংসের প্রাধান্য । অথচ নদীমাতৃক দেশের শ্যামল কোমল বাঙালি থাকতেও চেয়েছে। সেখানে সারাদিন

নাম তার রবীন্দ্রনাথ, তার জসীমউদ্দিন। তাঁদের কথায় তার আত্মার মুক্তি, তাঁদের সুরে তার প্রাণের আরাম।

ঢাকার সবচেয়ে বড় বাস আড্ডা গাবতলির সাকিল ভাই-এর কথা মনে পড়ছে। ওর কাজ যাত্রী ধরে আনা। কই যাইবেন? কুষ্টিয়া? খুলনা? আসেন আসেন, ভাল সিট আছে। দ্যান, সুটকেসটা আমারে দ্যান, এখনই যামু গিয়া। জি? অ, বেনাপোল যাইবেন? কইবেন তো? চলেন চলেন। কখন যাইবো? কী যে কন কর্তা, এই তো গেছি গিয়া।

এমনই হাজার কথা বলে, প্রায় বগলদাবা করে বাসের সিটে বসিয়ে তবে তার হাত থেকে ছড়ান। এইভাবে সারাদিনে কমিশন বাবদ ওর হাতে আসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা। কিছু বাঁচাতে পার? কী যে কন কর্তা, এক বেলা খাইতেন — কেন? একবেলা খেতে এত লাগবে কেন, এর কমেও তো হয়। হয়, তবে মাংসতো হয় না। তা রোজ রোজ মাংস নাই-বা খেলে। কী যে কন কর্তা, মাংস ভাত না খাইলে হয়?

সামান্য তথ্য। কিন্তু সুদূরপ্রসারী এত তত্ত্ব এর উৎসে। বিপরীতমুখী দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েন বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে, বাঙালি কোথায় পৌঁছল?

ধর্মের নামে এই বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসী ভূমিকা থেকে সাবধান হতেই হবে। ইউরোপ তার অন্ধকারময় চার্চের যুগ পেরিয়ে এসেছে। বর্তমান ভারতে নতুন করে ধর্মের ঠ্যালায় আমাদের শান্তি বিঘ্নিত। তথাকথিত হিন্দুধর্মের বহুধা বিকাশের ফলে, ভারতবর্ষের বহুজাতিক চরিত্রের বলে, বিচিত্রধর্মের সাংস্কৃতিক জীবনশৈলীর কল্যাণে এই ধর্মীয় সংকীর্ণতাবাদ সমাজের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে পারবে না — এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়।

বাংলাদেশ সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধর্মের এই ক্রমশ সর্বগ্রাসী ভূমিকা — বুঝতেই হবে, মঙ্গলময় পথের দিশা এটা নয়। বাঙালির সংস্কৃতির ধ্বংস করে, বাঙালির চরিত্র পালটে দিয়ে বাংলাদেশকে পিছন ফিরিয়ে দেওয়ার এই যে চক্রান্ত, তাকে ব্যর্থ করতে হবে বাঙালিকেই।

দু-একটি সাম্প্রতিক তথ্য জানা যাক। বর্তমান বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী একটি অংশে যারা নিজেদের ষোলো আনা মুসলমান মনে করেন এবং তালিবান-আত্মীয়তার কথা সগর্বে ঘোষণা করেন তারা, জমায়েত ইসলামীরা, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে পৌত্তলিকতা আবিষ্কার করে এটি পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বাংলা নববর্ষ এদের বিবেচনায় এবং বর্জনযোগ্য। একুশে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের অনুষ্ঠান পরিকল্পনাও এদের না-পসন্দ।

বাংলা-একাডেমি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বাংলা একাডেমি পরিচালিত বাংলাদেশ গ্রন্থমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোরাণ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে পাঠ হত। এবার শুধুমাত্র কোরাণ পাঠ হল, আমন্ত্রণপত্রে বিসমিল্লাহ ..... বসান হল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ঠিক নৈকুষ্যকুলীন মুসলমান বলে মানতেন না। বলা হত, এরা বড় বেশি বাঙালি। তাই কি এই মরণঝাঁপ? ডলার, পেট্রোডলার ভূমিকা কে জানে?

আমাদের কুষ্টিয়ার একের ভিতরে তিন দাদা বললেন, দ্যাখেন ভাইয়া, আমরা মুসলমান, ইমানের জন্য আমরা সব করতে পারি। আমরা হইলাম গিয়া ধর্মভী জাত। আল্লার রহে আমরা সব করতে পারি। শোনেন, হয়রতের বিদায় হজ্বের বাণী — হে মুসলমানগণ, হুঁশিয়ার। নেতৃ-আদেশ কখনও লঙঘন করিও না। যদি কোন কর্তিত নাসা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করিয়া দেওয়া হয়এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে।

অ্যালকোহল লাঞ্ছিত চোখের কাঁপিয়া গভীর ধর্মানুরাগীর মোলায়েম হাসি সহ আমাদের আলোচনা শেষ হল।

আমি আতঙ্কিত হই। মনে পড়ে গেল বাংলাদেশের আর এক মুসলমানের, নাকি বাঙালির কথা — 'ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িকতা — বাঙালিত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সেই চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। ভাষা অন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পর, মুক্তি যুদ্ধের তিরিশ বছর পর বাহান্ন ও একাত্তরে চেতনাবিনাশী চক্রান্ত যদি আমরা প্রতিহত করতে না পারি বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ভূখণ্ড পরিচিত হবে ভিন্ন কোন নামে, এদেশের মানুষ পরিচিত হবে বিজাতীয় কোন দর্শনের অনুসারী হিসাবে। বাংলা, বাঙালি ও বংলাদেশকে বাঁচাতে একে প্রতিহত করতেই হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com